শায়খুল হাদীস মুফ্‌তী মুহাম্মদ জসিমুদ্দীন রাহমানী
পরিচালক- মারকাজুল উলুম আল ইসলামীয়া,
বছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতিব- মারকাজ মসজিদ।
০১৭১২১৪২৮৪৩

তারিখ ঃ ২৬-০৪-২০১৩
সময় ঃ দুপুর ১২:১৫ ঘটিকা
স্থান ঃ মারকাজ মাদরাসা জামে মসজিদ, ঢাকা।
প্রতি জুম'আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন:
http://furqanmedia.wordpress.com
http://khutbatuljumua.wordpress.com

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার : প্রেক্ষিত মে দিবস

প্রেক্ষাপট :

পহেলা মে বিশ্বব্যপী শ্রম দিবস পালিত হচ্ছে। শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকদের অধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই চতুর্দিক থেকে নানা বক্তব্য শুনা যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ নারী শ্রমিকদের অধিকারের কথা বলে ইসলামের পর্দার বিধানের বিষয়টিকেও টেনে আনার চেষ্টা করছে। এমনকি নারীদেরকে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড় করানোর জন্য গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকদের জোর পূর্বক জড়ো করে ইসলাম বিরোধী নাস্তিক মুরতাদরা মহা সমাবেশ করার চক্রান্ত করছে। তাই এ প্রেক্ষাপটে ইসলামে শ্রমের মর্যাদা শ্রমিকদের অধিকার ও বিশেষ করে ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন। তাই আজকের আলোচ্য বিষয় 'ইসলামে শ্রমিকের অধিকার : প্রেক্ষিত মে দিবস'।

মে দিবস কি ও কেনো? :

১৮৮৬ সালের পহেলা মে আমেরিকার মেহনতী শ্রমিকশ্রেণী দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবী সহ আরো কয়েকটি নায্য দাবী অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জীবন বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলো। পহেলা মে এর ঐ ধর্মঘট দিবসের আগে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের কোনো অমুসলিম দেশে শ্রম আইন বলতে কিছু ছিলো না। শ্রমিকদের মানবিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বলতেও কিছু ছিল না। তারা ছিল মালিকের দাস মাত্র। তাদের কাজের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। ছিল না সাপ্তাহিক কোন ছুটি। ছিল না চাকুরীর স্থায়িত্ব ও ন্যায়সঙ্গত মজুরীর নিশ্চয়তা। মালিকরা তাদের ইচ্ছামত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিত। এমনকি দৈনিক ১৮-২০ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতেও বাধ্য করত শমিকদের। এ অন্যায়, বঞ্চনা ও যুলুমের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা পর্যায়ক্রমে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এ আন্দোলনের অংশ হিসাবে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' এর ১৮৮৫ সালের সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকা ও কানাডার প্রায় তিন লক্ষাধিক শ্রমিক শিকাগোর 'হে মার্কেটে' ঢালাই শ্রমিক, তরুণ নেতা এইচ সিলভিসের নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সর্বাত্নক শ্রমিক ধর্মঘট পালন করে। শ্রমিকদের সমাবেশ চলাকালে মালিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী পুলিশ ও কতিপয় ভাড়াটিয়া গুন্ডা সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে অতর্কিতভাবে গুলী চালিয়ে ৬ জন শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা ও শতাধিক শ্রমিককে আহত করে। কিন্তু এতেও শ্রমিকরা দমে যায়নি। শ্রমিকদের ইস্পাতকঠিন ঐ সফল ধর্মঘটের কারণে কোন কোন মালিক ৮ ঘন্টা কর্ম সময়ের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফলে শ্রমিকরা আরো উৎসাহী ও আত্নপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে এবং সর্বস্তরে ৮ ঘন্টা কর্ম সময়ের দাবী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২রা মে রবিবারের সাপ্তাহিক বন্ধের দিনের পর ৩ তারিখেও ধর্মঘট অব্যাহত রাখে।

ঐ নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে আয়োজিত ৪ঠা মে শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটের বিশাল শ্রমিক সমাবেশে আবারো মালিকগোষ্ঠীর গুন্ডা ও পুলিশ বাহিনী বেপরোয়াভাবে গুলী বর্ষণ করে। এতে ৪ জন শ্রমিক নিহত ও বিপুল সংখ্যক আহত হয়। রক্তে রঞ্জিত হয় 'হে' মার্কেট চত্বর। গ্রেফতার করা হয় শ্রমিক নেতা স্পাইজ ও ফিলডেনকে। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের পর শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রীতিমত 'চিরুনী অভিযান' চালিয়ে শিকাগো শহর ও এর আশপাশের এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ফিশার, লুইস, জর্জ এঞ্জেল, মাইকেল স্কোয়ার ও নীবেসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক নেতাকে।

পরবর্তীতে শ্রমিকদের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের বিরোধীতাকারী মালিকপক্ষের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'জুরি' গঠন করে ১৮৮৬ সালের ২১ জুন শুরু করা হয় বিচারের নামে প্রহসন। একতরফা বিচারের মাধ্যমে ১৮৮৬ সালের ৯ অক্টোবর ঘোষিত হয় বিচারের রায়। রায়ে বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে শ্রমিক নেতা পার্সন্স, ফিলডেন, স্পাইজ, লুইস, স্কোয়ার, এঞ্জেল ও ফিশারের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয় এবং ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর সে আদেশ কার্যকর করা হয়। শ্রমিক নেতা ও কর্মী হত্যার এ দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিবছর ১লা মে 'শ্রমিক হত্যা দিবস' ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দৈনিক ৮ ঘন্টা কার্য সময় ও সপ্তাহে এক দিন সাধারণ ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করে প্রথম শ্রম আইন প্রণীত হয়। অন্যদিকে নারকীয় এ

হত্যাজ্ঞ গোটা বিশ্বের শ্রমিকদের অধিকারে এনে দেয় নতুন গতি। শিকাগো শহরে সৃষ্ট এ আন্দোলন ক্রমশ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। পৃথিবীর সকল শ্রমজীবী মানুষ এ আন্দোলনের সাথে একাত্নতা ঘোষণা করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয় 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগানটি। সেই সাথে ১২৫ বছর আগে ঘটে যাওয়া সে ঘটনাটির কথা এখন প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্মরণ করা হয়ে থাকে 'বিশ্ব শ্রমিক দিবস' বা 'মে দিবস' হিসাবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে 'মে দিবস' :

পৃথিবীর অবহেলিত নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত ও অধিকার বঞ্চিত মজলুম শ্রমিকদের পক্ষে সর্বপ্রথম আওয়াজ বুলন্দ করেন ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.)। তিনি দাস-দাসী ও শ্রমিকদেরকে মালিকের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিজে যা খাবে শ্রমিকদের তা খাওয়াতে বলেছেন। নিজে যা পরিধান করবে দাস-দাসী ও শ্রমিকদের তা পরিধান করাতে বলেছেন। শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে অথবা কর্ম অনুযায়ী পারিশ্রমিক না দিয়ে পূর্ণ শ্রম আদায় করে নিতে নিষেধ করেছেন। শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পূর্ণ পারিশ্রমিক পরিশোধ করতে আদেশ করেছেন। বিভিন্ন অন্যায়ের কাফফারা হিসেবে গোলাম আযাদ করার বিধান মানবতার মুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ সনদ। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে মালিক শ্রমিক নির্বিশেষে সকলকেই আল্লাহর গোলাম হিসেবে প্রমাণ করাই ইসলামের মূল বক্তব্য। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নতুন করে 'মে দিবস' পালন করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ইসলামে দুই ঈদের দিবস, জুমা দিবস, আশুরা দিবস, রমজানের প্রতি রাত, বিশেষ করে শেষ দশকের বিজোড় রাত, জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাত ইত্যাদির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ দিবসগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা ম্লান করার জন্যই কুফফার শক্তিগুলো নানান দিবসের জন্ম দিয়েছে। পহেলা বৈশাখের পান্তা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা দিবস, ভালোবাসা দিবস, মা দিবস, ব্যক্তি পর্যায়ে জন্ম দিবস, বিবাহ দিবস, মৃত্যু দিবস ইত্যাদি দিবসগুলো তৈরীই করা হয়েছে ইসলামের ঐতিহ্যকে সুক্ষভাবে ধবংস করার জন্য। তাই মুসলিম জাতিকে আবার মাথা উচু করে দাড়াতে হলে বিজাতীয় তাহজিব তামাদ্দুনকে উৎখাত করে নিজস্ব তাহজিব তামাদ্দুন তথা ইসলামের শিক্ষা সাংস্কৃতি ও উৎসবকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মালিক ও শ্রমিক :

পৃথিবীর মানুষ আজ দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ হলো মালিক। আরেক ভাগ হলো শ্রমিক। প্রথম ভাগ শাসক দ্বিতীয় ভাগ শাসিত। প্রথম ভাগ শোষক, দ্বিতীয় ভাগ শোষিত। মালিক যে কাজ করায়, শ্রমিক যে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ে কারো কার্য সম্পাদন করে। মালিকানার আবার রয়েছে দুটি ধারা। একটি ব্যক্তিগত মালিকানা আরেকটি রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় মালিকানা। ব্যক্তিমালিকানা যা মূলত পূজিবাদী অর্থনীতির মূল উৎস। তা ব্যক্তিকে ঢালাওভাবে পূর্ণ স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা দান করে। সে যত সম্পদ উপার্জন করবে তা সবই একান্তভাবে নিজের মালিকানাধীন মনে করে। উপার্জনের এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার কারণে একদিকে মালিক পক্ষ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে, অপরদিকে শ্রমিক পক্ষ মালিকদের সম্পদ বৃদ্ধির মেশিনে পরিণত হয়েছে। এমনি এক মূহুর্তে আগমণ ঘটে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির। যাদের স্লোগান ছিলো কেউ খাবে তো কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না। কেউ গাছ তলায়, কেউ দশ তলায়, তা হবে না, তা হবে না। কারো কুকুর খায় খাসা, কারো নেই মাথা গোজার বাসা, তা হবে না, তা হবে না। এজন্য তারা ব্যক্তিমালিকানাকে উৎখাত করে সকল প্রকার কল-কারখানা, জায়গা-জমি ও আয়-উৎপন্নের সকল মালিকানা রাষ্ট্রীয়করণ বা জাতীয়করণ করার ফর্মূলা পেশ করলো। যেহেতু এই পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করা হবে না, তাই জুলুম ও শোষণের কোনো ছিদ্রপথও অবশিষ্ট থাকবে না। এই স্লোগানের মাধ্যমে তারা রাশিয়া, চীন সহ পৃথিবীর বহুদেশে লেলিন, কাল মার্কস ও মাও সেতুং এর শিষ্যরা নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করে। কিন্তু পরে দেখা গেলো সম্পূর্ন বিপরীত চিত্র। দেশের কল-কারখানা, জমি-জমাসহ আয়-উৎপন্নের সকল উপকরণের মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতার কাছে কুক্ষিগত হলো। শোষণের ছিদ্রপথ বন্ধ করার নামে দেশের সকল মানুষকে দিন-মজুর আর শ্রমিকে পরিণত করা হলো। এতে একদিকে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হলো। অপর দিকে দেশের আয় উৎপন্ন ব্যহত হতে লাগলো। মানুষ বুঝতে পারলো সমাজতন্ত্রের স্লোগান মাথা-ব্যথা দূর করার জন্য হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মাথা কেটে ফেলার সমতুল্য।

১৯৫৪ সনের আগস্ট মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য গৌরমুখ সিংহ রাশিয়া সফর করিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়াছেন, এখানে কিছুটা উল্লেখ করা যাচ্ছে। তিনি বলিয়াছেন:

'রাশিয়ার সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দেখিলে পাঁচশত রুবেল মজুরিররহস্য বুঝিতে পারা যায়। মনে রাখা দরকার যে, একটি রুবেলের মূল্য আমাদের দেশী টাকা অনুসারে১,০৯ টাকা মাত্র; কিন্তু সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদীর মূল্য নিম্নরূপ: একটি ডিমের মূল্য ৩ রুবেল, একটি মোরগের মূল্য ২৫ রুবেল, টমেটোর প্রতি কেজি মূল্য ২ রুবেল, দুগ্ধ প্রতি কেজি মূল্য ২০ রুবেল, আলুর প্রতি সের মূল্য ৬ রুবেল, মূলার প্রতি কেজি মূল্য ৫ রুবেল, গাজর প্রতি কেজি মূল্য ৮ রুবেল। শালগমের প্রতি

কেজি মূল্য ৭ রুবেল, ডবল রুটির প্রত্যেকটির মূল্য ২ রুবলে, বকরীর গোশত প্রতি সের মূল্য ১৮ রুবেল, ৬ সিট কাগজের মূল্য ৪ রুবেল, একটি শীতল কোর্তার মূল্য ৪ রুবেল, গমের এক মণ মূল্য ৮৫ রুবেল, মেয়েদের ছোট ব্যাগ প্রতিটি ৯০ রুবেল। এইখানে শুধুমাত্র কয়েকটি জিনিসের মূল্যের উল্লেখ করা হইল। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেখানে একজন মজুর পাঁচশত রুবেল বেতন পাইলেও তাহার জীবন মাত্রা মোটেই সচ্ছল হইতে পারে না। আর কেবল রাশিয়াই নহে, প্রতিটি কমিউনিষ্ট দেশেরই এই অবস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক ইশতেহার হইতে এইসব দেশের শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তাহাতে স্পষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে যে, ‘চেকোস্লোভাকিয়ার মজদুরদের দ্বারা ক্রীতদাসেদের ন্যায় কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত ভয়ানক পদ্ধতি। রাশিয়ার আইনে রাজনৈতিক সন্দেহসূত্রে শ্রমিকদিগকে বাধ্যতামূলক দাস শ্রমিকদের ক্যাম্পে বন্দী করিয়া রাখার সুযোগ রহিয়াছে।
অত:পর চীনের মজুর শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কেও খানিকটা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। কেননা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর কমিউনিষ্ট প্রচারক আজকাল কথায় কথায় চীন দেশের দোহাই দিয়া থাকেন।

১৯৫৯ সনে এপ্রিল মাসে ‘ইন্ডিয়ান ওয়ার্কাস ডেলিগেশন’ এর সদস্য হিসাবে ব্রজকিশোর শাস্ত্র সরকারী আমন্ত্রণক্রমে চীন গমন করে। সেখানে তিনি মজুর-শ্রমিকদের অবস্থা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতুহল প্রকাশ করেন। প্রায় ছয় সপ্তাহ কাল পর্যন্ত চীন ভ্রমণ করিয়া তিনি সেখানকার মজুর-শ্রমিকদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ:
‘এখানে আমরা হালের সঙে বলদের পরিবর্তে মেয়েলোককে বাঁধা দেখিয়াছি। সে কত মর্মান্তিক ও অমানুষিক দৃশ্য। মেয়েলোক তাহাকে হালের সঙে বোঁধে দেয়া হয়েছে।
চীনের ইংয়াস্টেরি ভারপ্রোজেক্ট এ সব মজুর শ্রমিককে তিনি কাজ করিতে দেখিয়াছেন, তাহাদের সম্পর্কে তিনি বলেন:
‘এই প্রোজেক্ট- এর নিকটে অফিসারদের থাকিবার বাংলা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার মজুর এখানে কাজ করে। সকল প্রকার পাথর ভাঙা হইতে শুরু করে সুড়ঙ্গ খোদাই করা কিংবা পাথরে চটান স্থানান্তরিত করা, প্রভৃতি যাবতীয় কাজই অনবৃত হাতে করা হইয়াছে। মজুরগণ যে সব হাতিয়ার ব্যবহার করিতেছিল, তাহা ছিল খুবই দুর্বল ও প্রায় অকেজো এবং নিকৃষ্ট ধরণের। মনে হইতেছিলো যে, তাহা কোন যাদুঘর হতে আনা হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘আমি এই দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্তের জন্য হতচেতন হইয়া পড়িলাম। চীন দেশের মেহনতী লোকদের দ্বারা যেভাবে কাজ করানো হচ্ছে তা দেখে তার অনুকরণ করা বা তা হতে কোন প্রকার প্রেরণা লাভ তো দূরের কথা; বরং বড়ই দু:খ ও বেদনা পাইলাম। আমি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লাম। মানুষ আর যাহাই হোক জন্তু নয়। কোনো দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে জন্তুদের স্থানে মানুষকে ব্যবহার করা মানবতার উপর নির্মম জুলুম ও চরম অমানুষিকতা ভিন্ন আর কি হতে পারে?
এর প্রতিবাদ করারও ভাষা নেই। মজুরদের বেশির ভাগ বহু দূর-দূরাঞ্চল হতে আনা হয়েছে। বর্তমান চাকুরী ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার তাহাদের কোন পথ নেই। মূলত চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ও প্রেসিডেন্ট মাও সেতুং এখানে বাধ্যতামূলক অমানুষিক শ্রমের রাশিয়া পরীক্ষিত ‘কার্যপদ্ধতি’ প্রয়োগ করেছেন।
মানুষ যখন এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো তখন বড় বড় কম্যুনিস্ট দেশগুলোর রাস্তা থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বিশাল আকারের মূর্তিগুলো ক্রেন দিয়ে টেনে সাগরে ফেলে দেয়া হয়। অবশ্য বাংলাদেশে কিছু খুচরা কম্যুনিস্টদের উৎপাত নতুন করে বেড়ে গেছে। সাগরে ভাটা লাগলেও তারা খালে জোয়ার আনার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এজন্য তারা এদেশের সরল সহজ শ্রমিক ভাই-বোনদের নানা রকম শ্রমিক সংগঠন তৈরী করে নিজেদের পক্ষে টানার জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমানে নারী শ্রমিকদেরকে ইসলামের বিপক্ষে দাড় করানোর জন্য ইস্যু তৈরী করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় ইসলামের শ্রমনীতি ও শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে জাতিকে সচেতন করা ঈমানী দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা :

ইসলাম মানুষকে শ্রমে উৎসাহিত করে। অলস জীবন-যাপন করা ইসলাম সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة : ১০]

অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। (সুরা জুমুআ, ৬২:১০)
রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

‘অন্যান্য ফরজের পরে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হলো হালাল উপার্জন করা।’ (বায়হাকী, ১২০৩০), মেশকাত (২৭৮১)
রাসুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম খাদ্য হলো নিজ উপার্জন থেকে ভক্ষণ করা।' (মুসনাদে আহমাদ ২৫২৯৬, তিরমিযি ১৩৫৮, আবু দাউদ ৩৫৩০, নাসায়ী ৪৪৬১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلاَّ أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ ».... صحيح مسلم – (২৩৯০)

'উত্তম উপার্জন থেকে যদি একটি খেজুরও সদাকাহ করা হয় তা অবশ্যই আল্লাহ (সুব.) নিজ হাতে গ্রহণ করেন। অত:পর তা লালন-পালন করেন যেমনিভাবে একজন মানুষ বকরীর বাচ্চা অথবা উটের বাচ্চাকে লালন পালন করে। এক পর্যায়ে তা পাহাড়ের ন্যায় বা তার চেয়ে বড় আকার ধারণ করে' (মুসলিম ২৩৯০)

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে–

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

রাসুলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো- সব চেয়ে উত্তম উপার্জন কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, সবচেয়ে উত্তম উপার্জন হলো মানুষের নিজের হাতের কামাই।' (মুসনাদে আহমাদ:১৭২৬৫, বায়হাকী:১০৭০০, মেশকাত:২৭৮৩)

শ্রমিকদের মর্যাদা

ক) শ্রমিকদের আল্লাহ (সুব.) ভালোবাসেন :

হাদীসে বর্নিত হয়েছে–

إنّ الله تعالى يُحِبُّ العَبْدَ المُؤْمِنَ المُحْتَرِفَ

'নিশ্চয় আল্লাহ (সুব.) শিল্প উদ্যোক্তা মুমিন বান্দাকে ভালোবাসেন।' (আল ফাতহুল কাবীর:৩৫৭২, আল জামেউস সগীর:১৮৭৩, কানযুল উম্মাল:৯১৯৯)

খ) নবী-রাসুল ও তাদের সাহাবাগণের অনেকেই শ্রমজীবি ছিলেন, গদ্দীনাশিন নয় :

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) অন্যের পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করেছেন। খাদিজা (রা.) এর ব্যবসা পরিচালনার কথা কে না জানে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীদেরও অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার অনেকেই শ্রমজীবি ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিলো না। বরং মর্যাদা নির্ণয় হতো তাকওয়ার ভিত্তিতে। যা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

{ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات ৪৯: ১৩]

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।' (সুরা হুজরাত, ১৩:৪৯)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَصَابَ نَبِيَّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– خَصَاصَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلاً لِيُصِيبَ فِيهِ شَيْئًا يَبْعَثُ بِهِ إِلَى نَبِىِّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِىُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَةَ عَشْرَ تَمْرَةً عَجْوَةً فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِىِّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم

'ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) ক্ষুধাগ্রস্থ হলেন। আলী (রা.) বিষয়টি জানতে পেরে কাজের উদ্দেশ্যে বের হলেন যাতে কিছু খাদ্য উপার্জন করে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট পাঠানো যায়। তিনি এক ইয়াহুদী বাগানে গেলেন। সতের বালতি পানি বাগানে দিলেন। প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একেকটি খেজুর মজুরি নির্ধারণ করার শর্তে। সতেরো বালতি পানি বাগানে ঢালার পরে ইয়াহুদী তাকে ১৭টি আজওয়া খেজুর নির্বাচন করার জন্য স্বাধীনতা দিলেন। আলী (রা.) সেগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসুলের কাছে চলে আসলেন।.....'(বায়হাকী ১১৯৮৩, ইত্তেহাফুল খিয়ারাহ আল মাহরাহ ৭৩৩৮)

অন্যান্য নবী রাসুদেরও অনেককেই শ্রমজীবি ছিলেন। দাউদ (আ.) সম্পর্কে হাদীসে বর্নিত হয়েছে–

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ۹ كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من كسب يده

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্নিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, দাউদ (আ.) নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া কোনো কিছুই খেতেন না।' (আল মু'জামূস সগীর ১৭, কানযুল উম্মাল ৯২১৯, ৯২২২, আল মু'জামূল কাবীর১২০৫)

শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার মজুরী পরিশোধ করা :

শ্রমিকের পাওনা অধিকার আদায়ের ব্যপারে কমবেশী সব ধর্মের কিতাবেই কিছু না কিছু উল্লেখ আছে। তবে ইসলাম যেভাবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে এসব বিষয়ে কথা বলেছে সেরকমভাবে অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ বা অন্য কোনো বই-পুস্তকে পাওয়া যায় না। শ্রমিক তার কাজ সম্পাদন করলে অনতিবিলম্বে পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا :« أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِى عَمَلِه »

'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তোমরা তাদের পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও।' (বায়হাকী ১১৯৯৮৮, আল ইত্তেহাফ ২৯৪১, মেশকাত ২৯৮৭,)

নিয়োগের পূর্বেই বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা :

কোনো শ্রমিক থেকে কোনো কাজ নেয়ার পূর্বেই তার শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করে নেওয়র প্রতি ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। অনেককে দেখা যায় রিকশা বা অন্য কোনো বাহনে ভাড়া নির্ধারণ না করেই উঠে যায়। আর পরবর্তীতে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে। এটি একেবারেই গর্হিত কাজ। এ কারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) শ্রমের মূল্য নির্ধারণ না করে শ্রমিক নিয়োগ করা থেকে বারণ করেছেন।' (মুসনাদে আহমাদ:১১৫৬৫, ১১৬৭৬, ১১৫৮২, বায়হাকী: ১১৯৮৬)

তবে যদি কোনো এলাকায় নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া নির্ধারণ করা থাকে অথবা সাধারণত যে পরিমাণ ভাড়া হতে পারে তার চেয়ে একটু বেশি দেখার খেয়াল থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। তা না পারলে দাঙা পুলিশ দিয়ে ঠ্যাঙ্গানো হয়।

বেতন নিয়ে টাল বাহানা করা :

বেতন নির্ধারণ করার পরে শ্রমিক যখন তার কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করে তখন মালিকের দায়িত্ব হলো অনতিবিলম্বে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা। বর্তমান যুগে অধিকাংশ কল-কারখানার মালিক ও পুঁজিদার শ্রমিক-মজুরদের প্রতি অশুভ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে থাকে। তারা মজুর-শ্রমিককে কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিয়োগ করে তিলে তিলে তার কাজ আদায় করে নেয়। অথচ তাদের যথেষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয় না। আবার অনেক সময় দিলেও নানান ফাঁদে ও কৌশলে অথবা প্রতারণা করে অধিকাংশ কেটে-ছেটে রেখে দেয়। তারপরও যে সামান্য পরিমাণ বেতন বা মজুরি প্রাপ্য হয় তাও যথা সময়ে আদায় করতে কুণ্ঠাবোধ করে। অফিসের নিয়ম-নীতির অজুহাতে অথাব মালিকের ব্যস্ততার অজুহাতে বেতন দিতে ইচ্ছাপূর্বক বিলম্ব করা হয়। মজুর-শ্রমিকরা যখন তাদের শিশু-সন্তানকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, অসুখ-বিসুখে, শীতে-গরমে অতিষ্ঠ দেখে মালিকের কাছে পাওনা পারিশ্রমিক দাবী করতে যায় তখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আকাশ-চুম্বি প্রাসাদের বিলাসবহুল অফিস থেকে হুঙ্কার ছাড়া হয় 'এখন দিতে পারব না। এক সপ্তাহ পরে আসো।' আর শ্রমিকরা যদি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। তাহলে নিজেদের পালিত সন্ত্রাসী ও লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তা না পারলে দাঙা পুলিশ দিয়ে শায়েস্তা করা হয়। মালিক ও পুঁজিদারদের এ ধরণের আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিচারমূলক। রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

'সামর্থবান মালিক বা পুঁজিদারের টাল-বাহানা অবশ্যই অন্যায় ও জুলুম।' (বুখারী ২২৮৭, ২৪০০, ২২৮৮, মুসলিম ৪০৮৫, তিরমিযী ১৩০৯, আবু দাউদ ৩৩৪৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَـاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ... صحيح البخاري - (২২২৯, ২২২৮, ২২৭০), سنن ابـن ماجـه - (২৪৪২), مسند أحمد - (৮৬৯২), السنن الكبرى للبيهقي - (১১৩৭৬), مشكاة المصابيح للتبريزي - (২৯৮৪)

'আল্লাহ (সুব.) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে আমি নিজেই প্রতিপক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নিবো। ১. যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাউকে কিছু দান করার ওয়াদা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ২. যে ব্যক্তি কোনো মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস হিসেবে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করে। ৩. যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিক বা কর্মচারি নিয়োগ করে যথাযথভাবে কাজ আদায় করে নিয়ে তার মজুরী পরিশোধ করে না।' (বুখারী ২২২৭:২২২৮, ২২৭০, ইবনে মাজাহ:২৪৪২, মুসনাদে আহমাদ:৮৬৯২, বায়হাকী:১১৩৭৬, মেশকাত:২৯৮৪).

শ্রমিকদের বেতন ছাড়াও তার মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু হতে তাকে কিছু দিবে :

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিককে শুধু বেতন-ভাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া উচিত নয়। বরং তার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য, খাদ্য, পোষাক ইতাদি থেকে কিছু অংশ প্রদান করা উচিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَــهُ فَلْيُقْعِــدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِى يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ »... صحيح مسلم – (৪৪০৭)

‘তোমাদের ভৃত্য যখন তোমার খাদ্য প্রস্তুত করে তোমার নিকট পরিবেশন করে, তখন তুমি তাকে তোমার সঙ্গে বসাও এবং তার মাধ্যমে তৈরীকৃত খাবারের কিছু অংশ তাকে খেতে দাও। খাবার যদি শুকনো হয় তবে তা হতে এক লোকমা বা দু লোকমা তার মুঠে তুলে দাও। কেননা আগুনের তাপ এবং ধোয়ার কষ্ট সে ই ভোগ করেছে।’ (মুসলিম ৪৪০৭)

রসুলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন–

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ فَادْعُوهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَكُمْ وَإِلَّا فَلَقِّمُوهُ فِــي يَدِهِ

‘যখন তোমাদের পাঁচক তোমাদের কাছে খাবার নিয়ে আসে তখন তাকে ডেকে তোমাদের সঙ্গে খেতে দাও। তা না হলে খাবারের কিছু অংশ তার হাতে তুলে দাও।’ (মুসনাদে আহমাদ:৮১৯৬)

বর্তমান যুগের তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য ও বিত্তবান লোকদের সম্পর্কে জানা যায় যে তারা তাদের খাদ্য থেকে ভৃত্য ও কাজের বুয়াকে খাদ্য দেওয়া তো দূরের কথা তাদের জন্য আলাদা খাবার তৈরী করা হয়। এমনকি নিজেরা উন্নতমানের চাল খেলেও বাবুর্চি ও গৃহ পরিচারিকাদের জন্য নিম্নমানের আলাদা চাল ক্রয় করা হয়। ইসলাম এ ধরণের আচরণকে চরমভাবে ঘৃণা ও প্রতিবাদ করে। এ হাদিসে শুধু খাদ্যের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি আরো ব্যপক অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। যারা মালিকের কাঁচামাল বা মূলধন খাটিয়ে পণ্য উৎপাদন করে তাদেরকে বেতন ছাড়াও নীট মুনাফা হতে কিছু অংশ প্রদান করা উচিত। গার্মেন্টস শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে মানুষের জন্য পোষাক তৈরী করে অথচ তার নিজের বা তার পরিবারের সদস্যদের ভালো কেনো পোষাক নেই। তাঁত শ্রমিক সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে থান কে থান কাপড় তৈরী করে। অথচ তার নিজের বা তার পরিবারের লোকদের পরিধানে ছিন্ন বস্ত্রটুকুও জোটে না। ইসলামের শ্রমনীতি কায়েম হলে এই অবাঞ্চিত পরিস্থিতির অবকাশ থাকতে পারবে না। কারখানার মালিক তার কুকুরকে পর্যন্ত মখমলের মূল্যবান বস্ত্রে আচ্ছাদিত করবে আর যে শ্রমিক কাপড় তৈরী করলো সে উলঙ্গ থাকবে তা ইসলাম কখনো বরদাশত করে না।

ইসলামে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক :

ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাই ভাই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْــهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

‘মারুর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু যর গিফারী (রা.) এর সাথে রাবাযা নামক স্থানে সাক্ষাৎ করালাম। তখন তার নিজের এবং তার কৃতদাসের শরীরে একই ধরণের পোষাক দেখতে পেলাম। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি একদা একজন মানুষকে (কৃতদাসকে) তার মা তুলে গালি দিয়েছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, হে আবু যর! তুমি তাকে তার মা তুলে গালি দিলে? নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এখনো জাহেলী যুগের চরিত্র রয়েগেছে। তোমাদের অধীনস্থ শ্রমিক ও কর্মচারী তোমাদের ভাই। আল্লাহ (সুব.) তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের যার অধীনে অপর কোনো ভাই থাকবে তাকে তাই খেতে দিবে যা নিজে খায় এবং তাই পরিধাণ করতে দিবে যা নিজে পরিধাণ করে। তাদেরকে তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দিবে না। যদি এরকম কোনো কাজ দিতেই হয় সেক্ষেত্রে তাকে তোমরা সাহায্য করো। (নিজে সহযোগীতা করে অথবা প্রয়োজনীয় আরো বেশী সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে)’। (বুখারী ৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০, মুসলিম ৪৪০৩, ৪৪০৫, তিরমিযি ১৯৪৫, আবু দাউদ ৫১৬০, ইবনে মাজাহ ৫১৬০, মুসনাদে আহমাদ ২১৪০৯)

এই হাদীস থেকে শিক্ষা :

ক) মালিক শ্রমিক পরস্পর ভাই। দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সে সম্পর্কই থাকবে।

খ) মালিক ও শ্রমিক খাওয়া-পরা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে।

গ) সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দিবে না।

ঘ) যদি সামর্থের বাইরে কোনো কাজ দিতে হয় সেক্ষেত্রে আরো সহযোগী দিতে হবে।

অপর হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ »

'অধীস্থ শ্রমিক-কর্মচারীর খাদ্য-বস্ত্রের অধিকার রয়েছে। তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেয়া যাবে না।' (মুসলিম:৪৪০৬, আবু দাউদ:৫১৬০, আল মুয়াত্তা:১৭৬৯, মুসনাদে আহমাদ:৭৩৬৪)

শ্রমিকের কর্তব্য :

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কল-কারখানার মালিক ও পুঁজিদারের ব্যপারে ইসলামে শ্রমনীতি বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করলাম। এবারে আমরা শ্রমিকদের কিছু দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে আলোচনা পেশ করবো।

১. চুক্তি মোতাবেক কাজ করা :

একজন শ্রমিকের প্রধান দায়িত্ব কর্তব্য হলো চুক্তি মোতাবেক মালিকের প্রদত্ত কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন– إنّ الله تعالى يُحبُّ منَ العاملِ إذا عَملَ أنْ يُحْسنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব.) উত্তমরূপে কার্য সম্পাদনকারী শ্রমিককে ভালোবাসেন।' (আল ফাতহুল কাবীর:৩৬০১, ১৪৩৬৯, আল মু'জামূল কাবীর:৪৪৮, বায়হাকী শু'আবুল ঈমান:৫৩১৫)

২. আল্লাহর হক ও মালিকের হক উভয়টির প্রতি খেয়াল রাখা :

কোনো মাখলুকের আনুগত্য করতে গিয়ে খালেকের অবাধ্য হওয়া যাবে না। অন্য কথায় আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো মানুষের হুকুম পালন করা যাবে না। আল্লাহর হুকুম ঠিক রেখে মালিকের হুকুম যথাযথভাবে পালন করা। এক্ষেত্রে আমানাতের খেয়ানত না করা। কোনো কোনো শ্রমিক কর্মকর্তা, কর্মচারী মালিকের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিয়মিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করে থাকে। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এজন্য অবশ্যই তাকে কিয়ামতের মাঠে বিচারের সম্মুখিন হতে হবে। পক্ষান্তরে যদি শ্রমিক তার উপর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে তাহলে তার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) দ্বিগুণ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ

'তিন শ্রেণীর মানুষকে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। তার মধ্যে এক শ্রেণী হলো ঐ শ্রমিক যে আল্লাহর হক আদায় করে ও নিজের মালিকের হক আদায় করে।' (বুখারী ৯৭, মেশকাত:১১, আল আদাবুল মুফরাত:৫৩, আল জামে বাইনাস সহীহাইন:৪২৮, রিয়াদুস সালিহীন:১৩৬৫)

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন সৎ শ্রমিকের জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। (অত:পর আবু হুরায়রা (রা.) বলেন) ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের প্রতি সৎ ব্যবহারের বিষয়গুলো না থাকতো তাহলে অবশ্যই আমি শ্রমিক হিসেবে মৃত্যু বরণ করতে পছন্দ করতাম।' (বুখারী ২৫৪৮, আল ফাতহুল কাবীর:৯৮৭৮, ফাতহুল বারী:১২৭, কানযুল উম্মাল:২৫১১৪, মুসনাদে বায্যার:৭৭৪৯)

৩. মালিকের সম্পদ সংরক্ষণ করা :

মালিকের জিনিসপত্র ভাঙচুর বা ধবংস না করে যথাযথভাবে হেফাজত করা। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণ হয় সে প্রতিষ্ঠানের প্রতি যত্নবাণ হওয়া খুবই জরুরী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ – إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ – فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

'যেহেতু কুরাইশ অভ্যস্ত, শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়। অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের 'ইবাদাত করে,' (সুরা কুরাইশ:১০৬:১-৩)

এ আয়াতে কুরাইশদেরকে বলা হয়েছে যেই ঘরের কারণে তাদের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ব্যবসায়িক সফরের সুবিধা রয়েছে। যে ঘরের কারণে তাদেরকে পৃথিবীর মানুষ সম্মান করে এবং নিরাপত্তা দেয় সেই ঘরের রবের ইবাদত করতে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই শ্রমিকদেরও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৪. সাধারণ শ্রমিকদের কোনো কাজে বাধ্য না করা :

শ্রমিক দিবসে সাধারণ শ্রমিকদেরকে কাজে যোগদান করা থেকে জোরপূর্বক বাধা প্রদান না করা, রাজনৈতিক সমাবেশে লোক সমাগমের জন্য গার্মেন্টস ও কল-কারখানার শ্রমিকদেরকে জোরপূর্বক অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা এগুলো শ্রমিক আইনের পরিপন্থি।

৫. রাস্তা অবরোধ ও গাড়ি ভাঙচুর না করা :
কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো সমস্যার কারণে রাস্তা অবরোধ করা, সাধারণ মানুষকে হয়রানী করা, গাড়ি ভাঙচুর করে মানুষের জানমালের ক্ষতি করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা। তবে নায্য দাবী আদায়ের জন্য দাবী-দাওয়া পেশ করা, মিছিল, মিটিং বা সমাবেশ করা অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অফিস ঘেরাও করা যেতে পারে।

৬. সহশ্রম বন্ধ করা :
নারী শ্রমিকদেরকে পুরুষ শ্রমিকদের সাথে সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে তাদের জন্য আলাদা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিমদের করণীয় :
ক) ইসলামের শ্রমনীতি সম্পর্কে শ্রমিকদের মাঝে ব্যপক প্রচারণা চালিয়ে তাদেরকে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করা।
খ) ইসলামিক শ্রমিক সংগঠন তৈরী করা। যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী সমাবেশ করতে না পারে।
গ) বিভিন্ন কল-কারখানা, গার্মেন্টস-ফ্যাক্টরী, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করা। এবং নিজ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
ঘ) নারী-পুরুষের জন্য সতন্ত্র কর্মক্ষেত্র তৈরী করে সমালোচকদের বাস্তব সম্মত জবাব দেয়া।
ঙ) দক্ষ কারীগর ও শ্রমিক তৈরী করার জন্য কারীগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
চ) আগামী প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরী করার জন্য তাজমহল ও বড় বড় দরগা-মাজার তৈরী করার পরিবর্তে ব্যপকভাবে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কোচিং সেন্টার ও ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা।

এভাবেই বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। শুধু সমালোচনা করেই নাস্তিক-মুরতাদদের মোকাবেলা করা যাবে না। মানুষ যখন তৃষ্ণায় হাহাকার করছে তখন আপনি একমাত্র পানির কূপটির সামনে দাড়িয়ে ঐ কূপের দূষিত পানি পান না করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। পিপাসায় কাতর লোকেরা আপনার কাছে বিকল্প বিশুদ্ধ পানির আবেদন করলো। আপনি বললেন না, আমার কাছে বিশুদ্ধ পানি নেই। তবে এই কূপের দূষিত পানি পান করতে দেয়া হবে না। তখন আস্তে আস্তে জড়ো হওয়া তৃষ্ণার্ত লোকেরা আপনাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে ঐ নষ্ট পানিই পান করবে। বর্তমানে আমরা মুসলিমরা তাই করছি।আমরা মুসলিমরা কবর আর মাজার তৈরী করছি, আর ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানরা নটরডেম কলেজ, যোসেফ স্কুল ইত্যাদি তৈরী করছে। আর এদেশের হাজী সাহেবরা ভালো লেখাপড়ার জন্য তাদের আদরের সন্তানদের খ্রীষ্টান স্কুলে ভর্তি করিয়ে ঈমানহারা নাস্তিক-মুরতাদ বানাচ্ছে। মুসলিম জাতি সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির সুযোগ নিয়ে তাদেরকে মুরীদ বানিয়ে হাদিয়া তোহফার নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আর নাস্তিক-মুরতাদরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, কল-কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে লক্ষ লক্ষ সরল, সহজ নারী-পুরুষকে নাস্তিকতা শিক্ষা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে দাড় করাচ্ছে। আমরা বিপদ-আপদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহুর্তে সমবেদনা প্রকাশ করি ও চোখের পানি ঝরাই। আর কাফের-মুশরিক, নাস্তিক-মুরতাদরা খাদ্য-পানী, ঔষধপত্র সহ সাহায্য নিয়ে দাড়ায়। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) এই কাজগুলোই আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) গারে হেরা থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে খাদীজা (রা.) এর কাছে এসে নিজের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন। তখন খাদিজা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনাকে আল্লাহ (সুব.) কখনো অপমান করবেন না। কেননা আপনি আত্নীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় মানুষদের বোঝা বহন করেন, অন্নহীন-বস্ত্রহীন মানুষদের সাহায্য করেন, পথিক-মুসাফির ও আগন্তুক মেহমানদের মেহমানদারী করেন, দুর্যোগ মুহুর্তে মানুষকে সাহায্য করেন। আর এই গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য যাদের থাকে তারা কখনোই অপমানিত হয় না। (বুখারী:৩, ৪৯৫৩, ৬৯৮২, মুসলিম:৪২২, মুসনাদে আহমাদ:২৫৯৫৯, বায়হাকী:১৮১৭৭, মেশকাত:৫৮৪১) তাই আসুন, আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী উপরোক্ত কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসি। আল্লাহ (সুব.) আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।